প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, 'বলাকা' ও রবীন্দ্রনাথ

বরেন্দু মণ্ডল

ইউরোপে সাম্রাজ্যবাদের (imperialism) উত্থান ও উন্নততর রাষ্ট্রগুলির সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের ফলশ্রুতি হিসেবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮) অনিবার্য ছিল। ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা, তৃতীয় বিশ্বের কবি হিসেবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধকে তিনি যেভাবে দেখেছিলেন, তা 'বলাকা'র (মে, ১৯১৬) দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয়ে আছে। 'বলাকা'র শতবার্ষিকী পাঠও তাই হয়ে ওঠে প্রথম বিশ্বযুদ্ধেরও পরাপাঠ। যদিও কেবল 'বলাকা' নয়— 'শান্তিনিকেতন' বক্তৃতামালা, 'কালান্তর'এর প্রবন্ধসহ প্রমথ চৌধুরী, সি. এফ. এণ্ডরুজ, অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা বেশ কিছু চিঠিতে আমরা পাব কবির সমকালীন অভিব্যক্তি।

'বলাকা' কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা 'সবুজের অভিযান' ১৫ বৈশাখ ১৩২১ শান্তিনিকেতনে রচিত, আর ৪৫ সংখ্যক শেষ কবিতা 'নববর্ষের আশীর্বাদ' রচিত হয় ৯ বৈশাখ ১৩২৩ বঙ্গাব্দে। প্রায় দু বছর ধরে 'বলাকা'-র কবিতাগুলি লেখা। এই কালপর্বে রবীন্দ্রনাথ বিদেশ ভ্রমণে যান নি। এই পর্বে কবির ভ্রমণ ও অবস্থানের দিকে অনুসন্ধানী দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে— 'বলাকা'র মোট সাতটি কবিতা শান্তিনিকেতনে থাকতে লেখা। কলকাতায় লেখা চারটি, রামগড়ে তিনটি, এলাহাবাদে চারটি, সুরুল-এ সাতটি, শিলাইদহ-পদ্মায় লেখা সতেরোটি, আর শ্রীনগরে থাকতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন দুটি কবিতা। একটি কবিতা সুরুল থেকে কলকাতায় ফেরার পথে রেলগাড়িতে লেখা। প্রথম চারটি কবিতা ('সবুজের অভিযান', 'সর্বনেশে', 'আহ্বান', 'শঙ্খ') বাদ দিলে, বাকি একচল্লিশটি কবিতা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের উন্মত্ত প্রহরের মধ্যে বসে লেখা। ইউরোপে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলোর এই মারণ-যজ্ঞ, অপেক্ষাকৃত দুর্বল রাষ্ট্রগুলোকে পর্যুদস্ত করে— তাদের দেশের সম্পদ লুঠ করে নিজের দেশকে সমৃদ্ধশালী করে তুলবার উগ্র বাসনা রবীন্দ্রনাথকে বিচলিত করে তুলেছিল।

দুই

'বলাকা'কে আরও অনেক রকম ভাবে পড়া যায়। পড়া হয়েছেও। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষিতে 'বলাকা'র একটি পাঠ প্রস্তাবনা প্রস্তুত করাই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। সেবার রামগড় পাহাড় থেকে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ফিরে এসেছেন ছুটির শেষে আষাঢ়ের

প্রথমেই (১৫ জুলাই ১৯১৪) খুলে গেছে বিদ্যালয়। এণ্ডরুজ ও পিয়র্‌স্‌ন তখন শান্তিনিকেতনে — উৎসাহের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের কাজে। ঐ সময় শান্তিনিকেতন পরিদর্শনে আসেন কয়েকজন বিদেশি অতিথি। মিশরের সিরিয়াদেশীয় আরবি কবি ওয়াদি এল্‌ বোস্তানি (Wedih El Boustony) ২৯ আষাঢ় আশ্রমে এসে রাত্রিবাসও করেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি' ও 'The Gardener' আরবি ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। বোস্তানি তাঁর কয়েকটি আরবি অনুবাদ গ্রন্থ রবীন্দ্রনাথকে উপহারও দিয়েছিলেন। সিরিয় কবি ছাড়াও ঐ সময় শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন পিয়র্‌সনের বন্ধু স্কটল্যান্ডের স্কুল-শিক্ষক মিস্টার ম্যাকডোনাল্ড, একজন আমেরিকান ও জনৈকা সুইডিস মহিলা। যুদ্ধের দামামা তখনও ভালো করে বাজেনি। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রজীবনী' বা প্রশান্তকুমার পালের 'রবিজীবনী'তে এমন কোনও তথ্য আমরা পাই না, যা থেকে অনুমান করা যায়— রবীন্দ্রনাথ সংশ্লিষ্ট বিদেশি অতিথিদের সঙ্গে বিশ্বযুদ্ধ প্রসঙ্গে কথা বলেছিলেন, বা বিদেশি অতিথিরা রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বযুদ্ধের খবর দিয়েছিলেন। অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি, জার্মানির বিরুদ্ধে সার্বিয়া-রাশিয়া-ব্রিটেন, ৪ আগস্ট ১৯১৪ (১৯ শ্রাবণ ১৩২১) যুদ্ধ ঘোষণা করে। পরের দিন বুধবার, ইউরোপ জুড়ে যুদ্ধের উন্মত্ততার খবর পেয়েই রবীন্দ্রনাথ (২০ শ্রাবণ/৫ আগস্ট) শান্তিনিকেতন মন্দিরের উপাসনায় ইউরোপ জুড়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির উন্মত্ততা-হিংসায় মানবেতিহাসের ভয়ংকর পরিণতি থেকে অব্যাহতির প্রার্থনা জানান ['মা মা হিংসীঃ' নামে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যায় (পৃ ১০৫-১০৭) তা ছাপা হয়। পরবর্তী কালে 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থে তা সংকলতি হয়। 'রবীন্দ্র রচনাবলী' ষোড়শ খণ্ড, ২২ শ্রাবণ ১৩৫০]। সেদিক দিয়ে দেখলে 'মা মা হিংসীঃ' বক্তৃতা বা রচনাটি প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কিত রবীন্দ্রনাথের প্রথম কোনো রচনা— যা প্রত্যক্ষ প্রণোদনাজাত। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধের খবর এসে পৌঁছানোর আগেই যে লেখা হয়েছে 'বলাকা'র ২ সংখ্যক 'সর্বনেশে' ('এবার যে ওই এল সর্বনেশে গো'), ৩ সংখ্যক 'আহ্বান' ('আমরা চলি সম্মুখ পানে') বা ৪ সংখ্যক 'শঙ্খ' ('তোমার শঙ্খ ধুলায় পড়ে')— শীর্ষক কবিতা তিনটি। বিশ্বযুদ্ধের খবর বা প্রত্যক্ষ কোনো অভিঘাত না থাকলেও যুদ্ধের আগে লেখা এই কবিতা তিনটিতেও এসেছে যুদ্ধের অনুষঙ্গ।

সচেতন পাঠকের মনে পড়ে যাবে 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থের ৬৪ সংখ্যক কবিতাটির কথা:

"শতাব্দীর সূর্য আজি রক্তমেঘ মাঝে
অস্ত গেল— হিংসার উৎসবে আজি বাজে
অস্ত্রে অস্ত্রে মরণের উন্মাদরাগিণী
ভয়ংকরী। ...

স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত; লোভে লোভে
ঘটেছে সংগ্রাম; প্রলয়মন্থন ক্ষোভে

ভদ্রবেশী বর্বরতা উঠিয়াছে জাগি
পঙ্কশয্যা হতে। লজ্জা শরম তেয়াগি
জাতিপ্রেম নাম ধরি প্রচণ্ড অন্যায়
ধর্মেরে ভাসাতে চাহে বলের বন্যায়।" [১]

রবীন্দ্রনাথ তখন শিলাইদহে। সেখানে পদ্মাতীরে শতাব্দীর শেষ সূর্যাস্ত দেখে (৩১ ডিসেম্বর ১৮৯৯ / সোমবার, ১৬ পৌষ) এই কবিতাটি লেখেন। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বানুভূতি, তাঁর অন্তর্দৃষ্টি বোধের এই পূর্ণতায় পৌঁছেছিল সেদিন— বুয়র-যুদ্ধের ঘটনা জানবার আগেই। ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলে বুয়ররা (Boer) তাদের নতুন বসতি 'অরেঞ্জ ফ্রি স্টেট' ও 'ট্রান্সভাল্' গড়ে তোলে। ওই অঞ্চল ছিল মূল্যবান খনিজ দ্রব্যে সমৃদ্ধ। ১৮৬৭-তে বুয়োরদের উপত্যকায় হীরের সন্ধান পাওয়া যায়। ১৮৮৪তে ট্রান্সভালে আবিষ্কৃত হয় সোনার খনি। ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো হীরে ও সোনার খনি দখলের জন ঝাঁপিয়ে পড়ে। ইংরেজরা অন্যায়ভাবে বুয়রদের আক্রমণ করে। প্রাথমিকভাবে জয় হয়ে বুয়রদের। ৯-১৭ ডিসেম্বর ১৮৯৯ ইংলণ্ডে সে কারণে কালাদিবস পালিত হয়। ইংরেজরা তখন রণনীতি পরিবর্তন করে, প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে বুয়োরদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিতে থাকে, নারী ও শিশুদের কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে আটকে রাখে। বর্বর সাম্রাজ্যবাদীদের এই আক্রমণ ও দুর্বল বুয়োরদের সেই লাঞ্ছনা কোনও এক তরঙ্গ ছুঁয়ে ঝংকার তুলেছিল রবীন্দ্রনাথের কাব্যবীণায়। এর কিছুদিন পরে ২৯ জানুয়ারি ১৯০০ বুয়োর যুদ্ধে ইংরেজদের সাহায্য করার জন্য টাউন হলে কলকাতার বিশিষ্ট মানুষদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভা থেকে সংগৃহীত ৬৫,৩০১ টাকা বুয়োর-যুদ্ধ তহবিলে দান করা হয়। রবীন্দ্রনাথ তার প্রতিবাদ করে লেখেন :

"স্বার্থের সমাপ্তি অপঘাতে। অকস্মাৎ
পরিপূর্ণ স্ফীতিমাঝে দারুণ আঘাত
বিদীর্ণ বিকীর্ণ করি চূর্ণ করি তারে
কালঝঞ্ঝা-ঝংকারিত দুর্যোগ-আঁধারে।
একের স্পর্ধারে কভু নাহি দেয় স্থান।
দীর্ঘকাল নিখিলের বিরাট বিধান।

স্বার্থ যত পূর্ণ হয় লোভ ক্ষুধানল
তত তার বেড়ে ওঠে - বিশ্বধরাতল
আপনার খাদ্য বলি না করি বিচার
জঠরে পুরিতে চায়। ..."[২]

(৬৫ সংখ্যক কবিতা : 'নৈবেদ্য')

এর ঠিক চোদ্দ বছর পরে ক্রান্তদর্শী রবীন্দ্রনাথ আবারও শুনতে পেয়েছিলেন সমস্ত ইউরোপ জুড়ে আবারও বাজছে 'অস্ত্রে অস্ত্রে মরণের উন্মাদ রাগিণী'। বুঝতে পেরেছিলেন

সাম্রাজ্যবাদী লালসায় আবারও 'স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত'। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পী যাঁরা, যাঁরা মহত্তম কবিপ্রতিভার অধিকারী— তাঁদের অবচেতন মন (unconscious / নির্জ্ঞান) তত জাগ্রত, সত্য এসে আপনি তাঁর কাছে ধরা দিতে চায়। বাধা পড়তে চায় তাঁর গানের সুরে, কবিতার শব্দবন্ধে অথবা রঙে, রেখায়। রবীন্দ্রনাথই তাই লিখতে পারেন :

"আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার যত উঠে ধ্বনি
আমার বাঁশির সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি," [৩]

(১০ সংখ্যক কবিতা : 'জন্মদিনে')

৪ আগস্টের আগে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের খবর রবীন্দ্রনাথের কাছে এমনি করেই এসেছিল। 'সর্বনেশে' কবিতার আলোচনার মধ্যেই আছে তার স্পষ্ট সমর্থন : "য়ুরোপীয় যুদ্ধের তড়িৎবার্তা এই কবিতা লেখার অনেক পরে আসে। এন্ড্রুজ সাহেব বলেন যে, 'তোমার কাছে এই সংবাদ যেন তারহীন টেলিগ্রাফে এসেছিল। আমার এই অনুভূতি ঠিক যুদ্ধের অনুভূতি নয়। আমার মনে হয়েছিল যে, আমরা মানবের এক বৃহৎ যুগসন্ধিতে যেন এসেছি, এক অতীত রাত্রির অবসান প্রায়। মৃত্যু দুঃখ বেদনার মধ্য দিয়ে বৃহৎ নবযুগের রক্তাভ অরুণোদয় আসন্ন।"[৪] আসন্ন মহাসমর ও 'হিংসার উৎসবে'-র প্রাক্কালে রবীন্দ্রনাথ তাই লিখতে পেরেছিলেন — 'এবার যে ওই এল সর্বনেশে গো'।

তিন

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করলে যুদ্ধ সংগঠিত হওয়ার মূলে প্রধানত দুটি কারণ আমাদের সামনে উঠে আসে— ক. ঐতিহাসিক কারণ, খ. তাৎক্ষণিক কারণ।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়— ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে সাম্রাজ্যবাদের উত্থানের পাশাপাশি ইউরোপের শক্তিধর রাষ্ট্রগুলির মধ্যে স্বার্থের সংঘাত তৈরি হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন— 'স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত, লোভে লোভে / ঘটেছে সংগ্রাম ...।' সাম্রাজ্যবাদের সম্প্রসারণের পাশাপাশি ইউরোপীয় রাজনীতি কয়েকটি জোটশক্তিতে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

১৮৭০ সালে জার্মানি ও ফ্রান্সের মধ্যে সেডানের যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে ফ্রান্স আলসেস ও লোরেন অঞ্চল দুটি জার্মানির হাতে তুলে দিতে বাধ্য হয়। আলসেস ও লোরেনের মতো সম্পদশালী অঞ্চল হাতছাড়া হওয়ার দুঃখ ফ্রান্স কখনো ভুলতে পারে নি। সেডানের যুদ্ধ ইউরোপীয় রাজনীতিতে জার্মানি ও ফ্রান্সের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী বিরোধিতার জন্ম দেয়। ১৮৭১ সালে চ্যান্সেলর বিসমার্কের নেতৃত্বে অল্প সময়ের মধ্যেই জার্মানি শক্তিশালী, শিল্পসমৃদ্ধ দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য ও বাণিজ্য গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ব্রিটেন তখন সবচেয়ে এগিয়ে। উনিশ শতকের নয়ের দশকে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য বিস্তারে জার্মানি ও ফ্রান্স দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ে সাম্রাজ্যবাদী লালসা নিয়ে। ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য গড়ে তোলার ক্ষেত্রে জার্মানি ও ফ্রান্সের পরে ইটালি ও বেলজিয়ামের মতো দেশও ব্রিটেনের প্রতিযোগী হয়ে ওঠে। বলকান অঞ্চলকে নিয়ে

রাশিয়ার সঙ্গে অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির সম্পর্ক তিক্ত হয়ে উঠেছে। ১৮৮৮ সালে জার্মানির সম্রাট পদে কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামের অভিষেক ঘটে। তিনি বিসমার্কের 'শক্তিসাম্য' নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না। কাইজার 'Weltpolitk' - আগ্রাসী পররাষ্ট্র নীতি ঘোষণা করেন— তার লক্ষ্য ছিল বিশ্ব-রাজনীতির ওপর জার্মানির আধিপত্য। কাইজারের সঙ্গে বিতর্কে জার্মানির চ্যান্সেলর পদ থেকে বিসমার্ক ১৮৯০ সালে পদত্যাগ করেন। বিসমার্কের অবর্তমানে রুশ-জার্মান নৈকট্যের সমস্ত সম্ভাবনা লুপ্ত হয়ে যায়। বিসমার্কের উদ্যোগে ১৮৮২ সালে জার্মানি, ইটালি ও অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি-র মধ্যে যে ত্রিশক্তি মৈত্রীচুক্তি সম্পন্ন হয়েছিল— বলকান অঞ্চল ও মরক্কো-তে আধিপত্যের প্রশ্নে ১৮৮৪ সালের পরে সেই মৈত্রীচুক্তি বিপন্ন হয়ে পড়ে। ঐ বছর জানুয়ারি মাসেই ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে মৈত্রীচুক্তি সম্পাদিত হয়।

উনিশ শতকে শক্তিশালী ব্রিটেনের অন্যতম ভিত্তি ছিল— বিশ্বজোড়া ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য ও বাণিজ্যবিস্তার। ১৮৮৮ থেকে ১৮৯৭ কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামের 'বিশ্ব রাজনীতি' (Weltpolitik) ও সামরিক খাতে ব্যয় বাড়িয়ে শক্তিশালী নৌশক্তি হিসেবে জার্মানির উত্থান, পাশাপাশি জার্মানির অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্রিটেনকে চাপে ফেলে দেয়। ইউরোপীয় রাজনীতি ও বিশ্ববাণিজ্যে জার্মানির মোকাবিলা করার জন্য ব্রিটেন তখন 'শত্রুর শত্রু, আমার মিত্র' নীতিতে জার্মানির প্রধান শত্রু ফ্রান্সকে মিত্র হিসেবে পেতে চাইল। রাজনৈতিক স্বার্থে ব্রিটেনকে মেনে নেওয়া ছাড়া ফ্রান্সের সামনে তখন কোনো পথ খোলা ছিল না। ১৯০৪ সালে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে মিত্রতাচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। মরক্কো প্রশ্নে ফ্রান্স ও ব্রিটেনের মধ্যে সম্পর্ক দৃঢ় হয়, জার্মানি মরক্কোতে ফ্রান্সের আধিপত্য স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়। আলজেরিসাস সম্মেলন (স্পেন, ১৯০৬) ব্রিটেন ও রাশিয়াকে কাছাকাছি এনে দেয়। রাশিয়ার প্রধান শত্রু তখন অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি, ফলে ব্রিটেনের সঙ্গে বন্ধুত্বে রাশিয়ারই লাভ। রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী আলেকজান্ডার ইজভোলস্কি সেদিন দক্ষ কুটনৈতিকের পরিচয় দিয়েছিলেন। অন্যদিকে ১৯০৪-০৫ রুশ-জাপান যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয়ে রুশ অর্থনীতি একেবারে ভেঙে পড়ে — ৩১ আগস্ট ১৯০৭ ব্রিটেন-রাশিয়ার মৈত্রীচুক্তি সেই ক্ষতে খানিকটা প্রলেপ দেয়। এভাবেই ইউরোপের শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলো জোটশক্তি হিসেবে দুটি বিরোধী পক্ষ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। এরপর ১৯০৮ সালে বসনিয়াকে কেন্দ্র করে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি বনাম সার্বিয়া বিরোধ চরম আকার নেয়। মরক্কো ও কঙ্গোকে কেন্দ্র করে জার্মানি বনাম ফ্রান্সের বিরোধ তীব্র হয়ে ওঠে। ১৯১২ সালে বলকান যুদ্ধ রাশিয়া বনাম অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির মধ্যে তিক্ততা আরও প্রখর হয়ে ওঠে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের তাৎক্ষণিক বা প্রত্যক্ষ কারণগুলি বিশ্লেষণ করলে একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে— সমগ্র ইউরোপ জুড়ে বিশ্বযুদ্ধের আয়োজন তখন ভিতরে ভিতরে পূর্ণ হয়ে উঠেছিল, দরকার কেবল একটা অজুহাতের। 'সেরাজেভো হত্যাকাণ্ড' (২৮ জুন ১৯১৪) ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির আগুন নিয়ে খেলায় ঘৃতাহুতি দিয়েছিল।

জাতিবৈরিতা, অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের প্রসার, অস্ত্র-প্রতিযোগিতা, ঔপনিবেশিক আধিপত্যবাদের প্রসারতার মধ্যে দিয়ে সমগ্র ইউরোপ ১৮৭০-১৯১৪ এই কালপর্বে বারুদের স্তূপে পরিণত হয়েছিল। 'সেরাজেভো হত্যাকাণ্ড' সেই স্তূপে অগ্নিসংযোগ করল মাত্র। অস্ট্রিয়ার যুবরাজ আর্চডিউক ফ্রাঞ্জ ফার্ডিন্যান্ড ও তাঁর স্ত্রী সোফি ২৮ জুন ১৯১৪ যান বসনিয়ার রাজধানী সেরাজেভো ভ্রমণে। ওই দিন উগ্র সার্ব-জাতীয়তাবাদী সংগঠন 'দি ব্ল্যাক হ্যান্ড'-এর সদস্য গার্ভিলো প্রিন্সিপ মাত্র পাঁচফুট দূর থেকে যুবরাজ ফার্ডিন্যান্ড ও যুবরানি সোফিয়াকে বেলজিয়ান পিস্তল দিয়ে গুলি করে খুন করেন।

'দি ব্ল্যাক হ্যান্ড' উগ্রপন্থী সার্ব জাতীয়তাবাদী এই সংগঠনটি সার্বিয়া সরকারের মদতপুষ্ট। সেরাজেভো হত্যাকাণ্ডের পরে রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি সরকার সার্বিয়াকে এগারোটি দাবি সংবলিত একটি চরম পত্র দেয়। আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে উত্তর দিতে বলা হয়। সার্বিয়া অধিকাংশ দাবি মেনে নিলেও দুটো বিষয় পুনর্বিবেচনা করতে বলে এবং তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতার প্রস্তাব দেয়। অস্ট্রিয়ার চরম পত্রের সমানে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করা অথবা রুশ সাহায্য নিয়ে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির প্রতিরোধে সামিল হওয়া— এই দুটি বিকল্প পথ তখন খোলা। জার্মানির সমর্থন নিয়ে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি তখন সার্বিয়াকে আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছে। 'সেরাজেভো হত্যাকাণ্ডে'র ঠিক এক মাসের ব্যবধানে সার্বিয়ার প্রস্তাবকে অগ্রাহ্য করে ২৮ জুলাই ১৯১৪ অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি সার্বিয়ার রাজধানী বেলগ্রেভ আক্রমণ করে। ২৯ জুলাই ১৯১৪ রাশিয়া সার্বিয়ার পক্ষে সেনা সমাবেশ করে। ৩১ জুলাই জার্মানি অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির পক্ষে যোগ দেয়। ১ আগস্ট মিত্রশক্তি জার্মানির নিয়ন্ত্রণাধীন সামোয়া এবং টোগো অঞ্চল বলপূর্বক অধিগ্রহণ করে। ফলস্বরূপ জার্মানি ঐ দিন রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ঐ দিনই ফ্রান্স মিত্ররাষ্ট্র রাশিয়ার হয়ে সেনা সমাবেশ করে। ২ আগস্ট ২০১৪ জার্মানি ও তুরস্কের মধ্যে সন্ধিচুক্তির মধ্য দিয়ে মিত্রতা গড়ে ওঠে। ইটালি তখনও পর্যন্ত নিরপেক্ষ অবস্থানে। ৩ আগস্ট জার্মানি ফ্রন্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ৪ আগস্ট ১৯১৪, জার্মানি বেলজিয়াম আক্রমণ করে। ফলস্বরূপ মিত্রশক্তির হয়ে ব্রিটেন জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে— শুরু হয়ে যায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। এক কোটি ত্রিশ লক্ষ মানুষের প্রাণের বিনিময়ে চার বছর তিন মাস সাত দিন ধরে চলতে থাকা যুদ্ধ অবশেষে— জার্মানির যুদ্ধবিরতি ঘোষণার মধ্য দিয়ে শেষ হয় ১১ নভেম্বর ১৯১৮। বিনাশর্তে জার্মানি মিত্রপক্ষ অর্থাৎ ব্রিটেন-ফ্রান্স-রাশিয়া-র কাছে আত্মসমর্পণ করে— দুপক্ষের মধ্যে যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ২৮ জুন ১৯১৯ বিজয়ী মিত্রপক্ষ ও পরাজিত জার্মানির মধ্যে ভার্সাইয়ের রাজপ্রাসাদে ৪৪০টি ধারা সম্বলিত একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়— বহু বিতর্কিত সেই ভার্সাই চুক্তির মধ্যে নিহিত ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীজ।

আমরা না চাইলেও, ব্রিটেনের উপনিবেশ হিসেবে ভারতবর্ষও প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। ৫ আগস্ট ১৯১৪ ভাইসরয় ভারতে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। আশ্চর্য এই, ভূপেন্দ্রনাথ বসুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মাদ্রাজ কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে (ডিসেম্বর ১৯১৪)

ভারতসম্রাট তথা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতি আনুগত্যের প্রস্তাব গৃহীত হয়। যুদ্ধে ব্রিটিশ সেনাদের ব্যয়ভার বহনের জন্য অজস্র রিলিফ ফাণ্ড খোলা হয়— সেখানে অনুদান দেবার জন্য দেশীয় রাজা, জমিদার ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে রীতিমতো হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। মিত্রপক্ষের হয়ে ১৩ লক্ষ ভারতীয় সেনা অংশগ্রহণ করে— যার মধ্যে ৭৪ হাজার ১৮৭ জন সেনা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে নিহত এবং ৬৭ হাজার ভারতীয় সেনা আহত অথবা চিরকালের জন্য পঙ্গু হয়ে যান। 'ভারতীয় অভিযাত্রী বাহিনী'-এ (Indian Expeditionary Force -A) থেকে 'ভারতীয় অভিযাত্রী বাহিনী - জি' ইউরোপের বিভিন্ন দেশে প্রত্যক্ষ রণাঙ্গণে জার্মান ও তুরস্ক সেনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। ব্রিটেনের উপনিবেশ হওয়ার কারণে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ভারতবর্ষকে যে মূল্য দিতে হয়েছিল— তা অপূরণীয় জাতীয় ক্ষতি।

চার

বিশ্বযুদ্ধের খবর শান্তিনিকেতনে এসে পৌঁছানোর পরেই মানবতাবাদী কবি রবীন্দ্রনাথ (৫ আগস্ট, বুধবার) মন্দিরের উপাসনায় বিশ্বযুদ্ধের ভয়ংকর পরিণতি থেকে অব্যাহতির জন্য প্রার্থনা জানালেন : "মানুষের সকল প্রার্থনার মধ্যে এই-যে একটি প্রার্থনা দেশে দেশে কালে কালে চলে এসেছে 'মা মা হিংসীঃ : আমাকে বিনাশ কোরো না, আমাকে মৃত্যু থেকে রক্ষা করো'।"[৫] সমস্ত মানুষের হয়ে রবীন্দ্রনাথ সেই প্রার্থনাই জানালেন। ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির শক্তিমত্ততার হিংস্র প্রদর্শনী, জাতিবৈরিতা ও পুঁজিবাদী লালসাকে ধিক্কার দিয়ে কবি সেদিন বলেছিলেন :

> "সমস্ত য়ুরোপে আজ এক মহাযুদ্ধের ঝড় উঠেছে। কতদিন ধরে গোপনে গোপনে এই ঝড়ের আয়োজন চলছিল! অনেক দিন থেকে আপনার মধ্যে আপনাকে যে মানুষ কঠিন করে বদ্ধ করেছে, আপনার জাতীয় অহমিকাকে প্রচণ্ড করে তুলেছে, তার সেই অবরুদ্ধতা আপনাকেই আপনি একদিন বিদীর্ণ করবেই করবে। এক-এক জাতি নিজ নিজ গৌরবে উদ্ধত হয়ে সকলের চেয়ে বলীয়ান হয়ে ওঠবার জন্য চেষ্টা করেছে। বর্মে চর্মে অস্ত্রে শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে অন্যের চেয়ে নিজে বেশি শক্তিশালী হবার জন্য তারা ক্রমাগতই তলোয়ারে শান দিয়েছে। পীস কন্‌ফারেন্স্, শান্তিস্থাপনের উদ্‌যোগ চলেছে; সেখানে কেবলই নানা উপায় উদ্ভাবন করে নানা কৌশলে এই মারকে ঠেকিয়ে রাখবার জন্য চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু, কোনো রাজনৈতিক কৌশলে কি এর প্রতিরোধ হতে পারে। এ যে সমস্ত মানুষের পাপ পুঞ্জীভূত আকার ধারণ করেছে; সেই পাপই যে মারবে এবং মেরে আপনার পরিচয় দেবে। সে মার থেকে রক্ষা পেতে গেলে বলতেই হবে : মা মা হিংসীঃ। পিতা, তোমার বোধ না দিলে এ মার থেকে আমাদের কেউ রক্ষা করতে পারবে না। কখনো এটা সত্য হতে পারে না যে, মানুষ কেবলমাত্র আপনার ভিতরেই আপনার সার্থকতাকে পাবে। তুমি আমাদের পিতা, তুমি সকলের পিতা, এই কথা বলতেই হবে। এই কথা বলার উপরেই মানুষের পরিত্রাণ। মানুষের পাপের

আগুন এই পিতার বোধের দ্বারা নিভবে; নইলে সে কখনোই নিভবে না, দাবানলের মতো সে ক্রমশ ব্যাপ্ত হতে হতে সমস্ত ছারখার করে দেবে। কোনো রাজমন্ত্রী কূটকৌশলজাল বিস্তার করে যে সে আগুন নেভাতে পারবে তা নয়; মার খেতে হবে, মানুষকে মার খেতেই হবে।

মানুষের এই-যে প্রচণ্ড শক্তি এ বিধাতার দান। তিনি মানুষকে ব্রহ্মাস্ত্র দিয়েছেন এবং দিয়ে বলে দিয়েছেন, যদি তুমি একে কল্যাণের পক্ষে ব্যবহার কর তবেই ভালো, আর যদি পাপের পক্ষে ব্যবহার কর তবে এ ব্রহ্মাস্ত্র তোমার নিজের বুকেই বাজবে। আজ মানুষ মানুষকে পীড়ন করবার জন্য নিজের এই অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্রকে ব্যবহার করেছে; তাই সে ব্রহ্মাস্ত্র আজ তারই বুকে বেজেছে। মানুষের বক্ষ বিদীর্ণ করে আজ রক্তের ধারা পৃথিবীতে প্রবাহিত হয়ে চলবে— আজ কে মানুষকে বাঁচাবে! এই পাপ এই হিংসা মানুষকে আজ কী প্রচণ্ড মার মারবে— তাকে এর মার থেকে কে বাঁচাবে!"[৬]

হিংসার বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ইতোপূর্বে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছেন সত্য, তবে হিংসা ও মানবতার চরম লাঞ্ছনার প্রশ্নে এই পর্বে কবিকে সবচেয়ে আলোড়িত মনে হয়।

২৮ জুন ১৯১৪, সেরাজেভো হত্যাকাণ্ডের অব্যবহিত পরেই · জুলাই-এ অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরিতে সৈন্য সমাবেশের উদ্দেশ্যে জার্মানি তাদের সৈন্য যাতায়াতের জন্য বেলজিয়ামকে অবাধ মুক্তাঞ্চল হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়ে— বেলজিয়াম সরকারের কাছে অনুরোধ করে। বেলজিয়াম সরকার সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলে ৪ আগস্ট ১৯১৪ জার্মানি বেলজিয়াম আক্রমণ করে। সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিহত করবার চেষ্টা করলেও ১৬ আগস্ট জার্মানির কাছে বেলজিয়াম পরাজিত হয়। শান্তিনিকেতনে থাকুন বা কলকাতায়— বিশ্বযুদ্ধের খবর ও গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ অবহিত ছিলেন। শান্তিপ্রিয় দেশ বেলজিয়ামের প্রতিরোধ রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছিল। ৪ ভাদ্র ১৩২১ (২১ আগস্ট ১৯১৪) একটি গানে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন :

"বাঁধা দিলে বাঁধবে লড়াই, মরতে হবে।
পথ জুড়ে কি করবি বড়াই, সরতে হবে।।
লুঠ-করা ধন ক'রে জড়ো কে হতে চায় সবার বড়ো
এক নিমেষে পথের ধুলায় পড়তে হবে।"[৭]

আমৃত্যু রবীন্দ্রনাথ যুদ্ধের বিরুদ্ধে— এখানে সাম্রাজ্যবাদী হিংস্রতাকে বেলজিয়াম যেভাবে প্রতিহত করেছে, রবীন্দ্রনাথ তাকেই সমর্থন করেছেন। পরের দিন সকালে (৫ ভাদ্র ১৩২১) রবীন্দ্রনাথ লিখলেন— 'মত্ত সাগর দিল পাড়ি গহন রাত্রিকালে / ওই যে আমার নেয়ে।' [৮]

মহাসমর ততদিনে তিন সপ্তাহ অতিক্রান্ত, সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলোর হিংস্রতায় হাজার

হাজার নিরপরাধ মানুষ ও শিশুর মৃত্যু ক্রান্তদর্শী কবিকে আরও বিচলিত করে তুলেছে। ৯ ভাদ্র ১৩২১ (২৬ আগস্ট ১৯১৪)— সেদিনও বুধবার, শান্তিনিকেতন মন্দিরে উপাসনা কালে রবীন্দ্রনাথ আবারও বললেন :

> আমাদের প্রার্থনা সকল সময়ে সত্য হয় না, অনেক সময় মুখের কথা হয়; কারণ, চারিদিকে অসত্যের দ্বারা পরিবৃত হয়ে থাকি বলে আমাদের বাণীতে সত্যের তেজ পৌঁছয় না। কিন্তু, ইতিহাসের মধ্যে, জীবনের মধ্যে, এমন এক-একটি দিন আসে যখন সমস্ত মিথ্যা এক মুহূর্তে দগ্ধ হয়ে গিয়ে এমনি একটি আলোক জেগে ওঠে যার সামনে সত্যকে অস্বীকার করবার উপায় থাকবে না। তখনই এই কথাটি বার বার জাগ্রত হয় : বিশ্বানি দেব সবিতার্দুরিতানি পরাসুব। হে দেব, হে পিতা, বিশ্বপাপ মার্জনা করো। ...
>
> আজ এই যে যুদ্ধের আগুন জ্বলছে এর ভিতরে সমস্ত মানুষের প্রার্থনাই কেঁদে উঠেছে : বিশ্বানি দুরিতানি পরাসুব। বিশ্বপাপ মার্জনা করো। আজ যে রক্তস্রোত প্রবাহিত হয়েছে সে যেন ব্যর্থ না হয়। রক্তের বন্যায় যেন পুঞ্জীভূত পাপ ভাসিয়ে নিয়ে যায়। যখনই পৃথিবীর পাপ স্তূপাকার হয়ে উঠে তখনই তো তাঁর মার্জনার দিন আসে। আজ সমস্ত পৃথিবী জুড়ে যে দহনযজ্ঞ হচ্ছে তার রুদ্র আলোকে এই প্রার্থনা সত্য হোক : বিশ্বানি দুরিতানি পরাসুব। আমাদের প্রত্যেকের জীবনের মধ্যে আজ এই প্রার্থনা সত্য হয়ে উঠুক।”[৯]

ভয়ংকর অস্থির, হন্তারক ঐ সময়ের মধ্যে থেকেও কবি বারংবার উচ্চারণ করেছেন অহিংসার কথা, দীপ্ত কণ্ঠে গেয়েছেন মানবতার জয়গান।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দানবীয় হত্যালীলা, ‘মৃত্যুর গর্জন’ আর ‘ক্রোন্দনের কলরোল’ যখন সমস্ত জাগতিক সীমা লঙ্ঘন করেছিল, রবীন্দ্রনাথ তখন আরও একবার শান্তিনিকেতন মন্দিরে বসেছিলেন উপাসনায় (২৫ জানুয়ারি ১৯১৬)। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বিষয়ে এটাই রবীন্দ্রনাথের শেষবারের মতো প্রার্থনা। ‘তত্ত্ববোধিনী’ (সম্পাদক, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর) পত্রিকার ফাল্গুন ১৩২২ সংখ্যায় সেই খবর ও বক্তৃতা প্রকাশিত হয়। (পৃষ্ঠা সংখ্যা ২১৬-২১৮)। আশ্চর্যজনকভাবে, বিশ্বযুদ্ধ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের আশঙ্কা বা উৎকণ্ঠা ‘বলাকা’ প্রকাশের পর থেকে আমরা আর সেভাবে প্রত্যক্ষ করি না।

পাঁচ

‘বলাকা’র প্রেক্ষাপট জুড়ে যেমন আছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অনুষঙ্গ, তেমনি কবিতাগুলোর ভাষা নির্মাণ, প্রকাশের ক্ষেত্রে আছে ‘সবুজ পত্রে’র প্রণোদনা। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় জানাচ্ছেন :

> “১৯১৩ সালের নভেম্বর মাসের শেষদিকে শান্তিনিকেতনে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি উপলক্ষে কবি-সম্বর্ধনায় রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাষণের প্রতিক্রিয়ায় যে হলাহল বাংলা সাময়িক সাহিত্যের উছলিয়া উঠে, তাহাতে কবি অন্তরে অন্তরে

জর্জরিত হন; এবং স্থির করেন যে সাময়িকপত্রের জন্য কিছু লিখিবেন না। ইতিমধ্যে মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও প্রমথ চৌধুরীর মধ্যে একখানি নূতন ধরনের পত্রিকা প্রকাশনের আলোচনা চলিতেছিল। শুনিয়াছি, কলিকাতা হইতে মণিলাল পত্রিকা প্রকাশের প্রস্তাব লইয়া কবির নিকট শিলাইদহে উপস্থিত হন। সমস্ত কথা শুনিয়া কবি প্রমথ চৌধুরীকে বলিয়া পাঠান যে প্রমথ যদি পত্রিকা বাহির করেন তবে তিনি লেখা দিবেন। তদুত্তরে প্রমথবাবু জানান রবীন্দ্রনাথ যদি লেখা দেন, তবে পত্রিকা প্রকাশের দায় তিনি গ্রহণ করিবেন।"[১০]

রবীন্দ্রনাথ নিজেও সেই স্বীকৃতি দিয়েছেন 'সবুজ পত্র'কে। 'বলাকা' 'ব্যাখ্যা ও আলোচনা'র সূচনাতেই বলেছেন : "এই কবিতাগুলি প্রথমে সবুজপত্রের তাগিতে লিখতে আরম্ভ করি।"[১১] 'বলাকা'র ৪৫ টি কবিতার ছাব্বিশটি প্রকাশিত হয় 'সবুজ পত্রে', আর বাকিগুলো প্রকাশিত হয়েছিল— 'প্রবাসী', 'ভারতী', 'মানসী'তে। যৌবনের জয়গান, মহাবিশ্বের চিরস্থির-চিরচঞ্চলের মধ্যে অবিরাম গতিবেগের অনুভূতি, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হিংস্রতা ও মানবতার লাঞ্ছনা, প্রেম ও মৃত্যু-ভাবনা, সৌন্দর্যদর্শন ও ঈশ্বরচেতনা— 'বলাকা'র কবিতার এই যে অনেক রূপ, নানান মেজাজ, দার্শনিক বীক্ষার বৈচিত্র্য, তার মূলে আছে 'সবুজ পত্রে'র তাগিদ। 'বলাকা'পর্ব থেকে রবীন্দ্রকাব্যের যে নতুন যুগের সূচনা হল, 'সবুজ পত্র' তার বাহন।

রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিকতাবোধ, পাশ্চাত্য ভ্রমণ ও নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির বিষয়গুলিকেও এই পর্বে মনে রাখতে হয়। 'বলাকা'-র প্রকাশ বা প্রথম বিশ্বযুদ্ধকে যদি মাঝখানে রেখে রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণ মানচিত্র দেখি তাহলে দেখতে পাব— ১৯১৬র আগে রবীন্দ্রনাথ ইউরোপ গেছেন মাত্র তিনবার— ১৮৭৮, ১৮৯০ ১৯১২-১৩। আর আমেরিকা ভ্রমণে গেছেন একবার ১৯১২। রবীন্দ্রনাথের বিশ্ব-পরিক্রমার অধিকাংশই 'বলাকা' প্রকাশ বা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে। (দ্বিতীয় পর্বে বিলেত ভ্রমণ - ১৯২০, ১৯২১, ১৯২৬, ১৯৩০, দ্বিতীয় পর্বে আমেরিকা ভ্রমণ- ১৯১৬, ১৯২০, ১৯২৯, ১৯৩০, জাপান - ১৯১৬, ১৯১৭, ১৯২৪,১৯২৯, ফ্রান্স - ১৯২০, ১৯২৬, ১৯৩০, জার্মানি - ১৯২১, ১৯২৬, ১৯৩০, ইটালি- ১৯২৫, ১৯২৬, স্পেন - ১৯২১, চীন - ১৯২৪, আর্জেন্টিনা - ১৯২৪ ইরাক-ইরান- ১৯৩২, রাশিয়া - ১৯৩০, জাভা-সুমাত্রা-সিঙ্গাপুর-ইন্দোনেশিয়া- ১৯২৭, ইন্দোচীন-১৯২৯, কানাডা- ১৯২৯, মিশর- ১৯২৬, চেক প্রজাতন্ত্র-১৯২৬, হাঙ্গেরি- ১৯২৬, অস্ট্রিয়া- ১৯২৬, সুইডেন- ১৯২৬, নরওয়ে- ১৯২৬, হল্যাণ্ড - ১৯২০, বেলজিয়াম - ১৯২০, ডেনমার্ক - ১৯২৬, সুইজারল্যান্ড- ১৯২৬)। রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পর্বের এই ভ্রমণ অনেকটাই নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি পরবর্তী খ্যাতির কারণে।

বিশ্বযুদ্ধের আগে এবং পরের এই ভ্রমণের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রবীন্দ্রনাথের তৃতীয়বারের ইংল্যাণ্ড ভ্রমণ। এই পর্বে রবীন্দ্রনাথ ২৪ মে ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে যাত্রা শুরু করছেন। বিলেত, আমেরিকা ঘুরে রবীন্দ্রনাথ দেশে ফিরে আসবেন ৬ অক্টোবর

১৯১৩। এই দীর্ঘ সময় ইউরোপ ও আমেরিকায় থাকার ফলে সেখানকার রাষ্ট্রব্যবস্থা, বিশেষত ইউরোপের দেশগুলির সাম্রাজ্যবাদী চেহারা, পুঁজিবাদী আগ্রাসন রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। 'বলাকা'র কবিতা রচনার প্রথম পর্বে সেই অভিজ্ঞতা তাঁর মগ্ন চৈতন্যে আশঙ্কা হয়ে এল।

দীনবন্ধু এণ্ডরুজ লিখেছেন : "আসন্ন বিশ্বযুদ্ধের কোনো খবর তখনো আমরা পাই নি। এমন কি, শান্তিনিকেতনে এত নির্জনে আমরা ছিলাম যে এ বিষয়ে সম্ভাব্য আলোচনা বা কোনো ইঙ্গিত পর্যন্ত আমাদের কানে আসে নি। অথচ কত আগেই তাঁর মন সেই ঘনিয়ে-আসা-দুর্যোগের আশঙ্কায় ছেয়ে গেছে। এই সময়েই তিনি 'বলাকা'র 'সর্বনেশে' কবিতাটি লেখেন। এবং যুদ্ধারম্ভের কয়েক সপ্তাহ পূর্বেই এই আশ্চর্য কবিতাটি প্রকাশিত হয়।" [১২] রবীন্দ্রনাথ লেখেন :

"এবার যে ওই এল সর্বনেশে গো।
বেদনায় যে বান ডেকেছে,
রোদনে যায় ভেসে গো!
রক্তমেঘে ঝিলিক মারে,
বজ্রবাজে গহন - পারে
কোন্ পাগল ওই বারে বারে
উঠছে অট্টহেসে গো
এবার যে ওই এল সর্বনেশে গো।

জীবন এবার মাতল মরণ-বিহারে।
এই বেলা নে বরণ ক'রে
সব দিয়ে তোর ইহারে।"[১৩]

ঠিক যুদ্ধ নয়, কবি বুঝতে পারছিলেন 'আমরা মানবের এক বৃহৎ যুগসন্ধিতে যেন এসেছি।' মৃত্যু-দুঃখ-বেদনার মধ্য দিয়ে নবযুগের প্রভাত আসন্ন। যদিও রবীন্দ্রনাথ আমাদের সচেতন করে দিয়েছেন — 'সর্বনেশে' কোনো রূপক বা symbol নয়, তবু 'বলাকা'র পাঠক মাত্রই 'সর্বনেশে'কে যুদ্ধের বেশে দেখতে ইচ্ছে করে।

'বলাকা'র ৩ সংখ্যক 'আহ্বান' ('আমরা চলি সমুখ পানে') শীর্ষক কবিতাটিও রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন রামগড় থাকার সময় — ৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩২১। ২ সংখ্যক কবিতার 'সর্বনেশে'— 'আহ্বান' কবিতায় রুদ্ররূপে প্রকাশলাভ করেছে :

"আমরা চলি সমুখ পানে,
কে আমারে বাঁধবে?
রইল যারা পিছুর টানে
কাঁদবে তারা কাঁদবে।

রুদ্র মোদের হাঁক দিয়েছে
বাজিয়ে আপন তূর্য।
মাথার পরে ডাক দিয়েছে
মধ্যদিনের সূর্য।"[১৪]

যাঁরা আলোর পথযাত্রী, যাঁরা নবযুগের স্রষ্টা — তাঁরা পুরাতন, জীর্ণ যা কিছু তা ফেলে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে। যাঁরা নবযুগের অগ্রপথিক, তাঁদের পথে পথে পাথর ছড়ানো; অনেক বাধা— তার সবকিছুকে চূর্ণ করে রুদ্রের আহ্বানে তাঁরা এগিয়ে যাবেন, কেননা রুদ্রই যে চালক। এই পর্বে রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছে : "মৃত্যুর ভিতর দিয়ে অমৃতকে সন্ধান করবার জন্য পৃথিবীজুড়ে প্রলয় ব্যাপার চলছে।"[১৫] যাঁরা নবযুগের বাণীবাহক, ঘরছাড়া সেই 'মহাযুগের যাত্রী'দের এগিয়ে যেতে হবে এর মধ্যে দিয়েই।

'বলাকা' রচনার শুরুতে যে ভাবনা কবিকে উৎকণ্ঠিত করেছিল ('বিশ্বব্যাপী একটা ভাঙাচোরা প্রলয়কাণ্ডের উদ্যোগপর্ব চলছে') — 'শঙ্খ' কবিতাটি রচনাকালেও রবীন্দ্রনাথের কবিমননে সেই ভাবটি জেগে ছিল।

"তোমার শঙ্খ ধুলায় প'ড়ে,
কেমন করে সইব?
বাতাস আলো গেল মরে
এ কি রে দুর্দৈব! [১৬]

'শঙ্খ' একটি রূপক। "বলাকা'র শঙ্খ বিধাতার আহ্বান শঙ্খ"। "মানুষকে মিলিত করবার, নবযুগকে আহ্বান করবার, পাঞ্চজন্য শঙ্খ ধুলায় পড়ে রয়েছে। একে গ্রহণ করবার মধ্যে অনেক দুঃখ রয়েছে।"[১৭] এই শঙ্খের মধ্যে দিয়ে তাঁর ('ঈশ্বর') আদেশ ধ্বনিত হচ্ছে। এই শঙ্খের ভার (দায়িত্ব) রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর দিয়েছেন তাঁর উপর— পুজোর ছলে শঙ্খকে তখন তো আর মাটিতে ফেলে রাখা যায় না। এই শঙ্খের মধ্য দিয়ে বিশ্ববাসীর কাছে নবযুগের আহ্বান আসবে, যাঁরা আলোর পথযাত্রী, বিশ্বজোড়া প্রলয়ের মধ্যে এই শঙ্খই তাঁদের পথ দেখাবে। কবির তাই মনে হয়েছে এই শঙ্খ পুজোর সামান্য উপকরণ মাত্র নয়। আরতিদীপ জ্বেলে, পুজোর অর্ঘ্য সাজিয়ে দেবালয়ের নিভৃত কোণে বসে এখন পুজোর সময় নয়; আরামের শয্যাতলে বিশ্রামের সময়ও নয় — বিশ্বমানবকে ডাক দেবার জন্যে তাঁর এই শঙ্খকে এখন তুলে ধরতে হবে :

"জানি জানি তন্দ্রা সম
রইবে না আর চক্ষে।
জানি শ্রাবণ-ধারা-সম
বাণ বাজিবে বক্ষে।
কেউ বা ছুটে আসবে পাশে,

কাঁদবে বা কেউ দীর্ঘশ্বাসে,
দুঃস্বপনে কাঁপবে ত্রাসে
সুপ্তির পর্যঙ্ক
বাজবে যে আজ মহোল্লাসে
তোমার মহাশঙ্খ।"[১৮]

এই শঙ্খকে গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে মানুষ যদি মৃত্যু-শোক-দুঃখকে বরণ করে নিতে পারে, সমস্ত আঘাতকে সহ্য করতে পারে, তবেই সেই শঙ্খ নতুন পথের যাত্রীদের বুকের মধ্যে বেজে উঠবে। আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন-এর 'গ্রন্থ-ভূমিকা'-য় উল্লিখিত রবীন্দ্রনাথের নিজের কথা এখানে আমরা একটু শুনব :

"১৩২১ সালের জ্যৈষ্ঠ মাস। হিমালয় রামগড়ে আছি; মীরা ও বৌমা আছেন সঙ্গে। আমার মনের মধ্যে একটা দারুণ বেদনা। সে সব কথা তাঁরা জানবেন কেমন করে? তার কিছু খবর জানতেন এন্ড্রুজ সাহেব। তিনি যখন রামগড়ে আমার কাছে এসে আমার অন্তরের কথা জিজ্ঞাসা করলেন তখন আমি আমার বেদনা তাঁকে জানালাম। খবর পাইনি, প্রমাণ পাইনি, তবু মনে হচ্ছিল সারা জগৎ জুড়ে যেন একটা প্রলয় কাণ্ড আসচে। বিশ্বব্যাপী একটা ভাঙাচোরা প্রলয়কাণ্ডের উদ্যোগপর্ব চলচে। ৫ই জ্যৈষ্ঠ হতে ১২ই জ্যৈষ্ঠের মধ্যে আমার দুই, তিন, চার, নম্বর কবিতা একে একে এলো। বলাকার মতোই একে একে এরা আমার মানসলোক হতে বেদনাহত হয়ে কোন্ নিরুদ্দেশে যাত্রা করেচে। এদের মধ্যেও ভিতরে ভিতরে বলাকার মতোই একটি পংক্তিগত যোগ রয়েচে। তাই এই কবিতাগুলির বলাকা নাম সার্থক হয়েচে। তখন য়ুরোপের মহাযুদ্ধের খবর এদেশে আসেনি- আমার চার নম্বর কবিতা লেখবার পর যুদ্ধের খবর পেলাম। তবু কি এক অব্যক্ত কারণে আমার মনের সেই বেদনা এই কবিতাগুলিতে বেরিয়ে এসেচে।

য়ুরোপের দারুণ যুদ্ধের খবর এলো। দারণ প্রলয়ের সূচনা হলো। যুদ্ধের শঙ্খ বাজলো। ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক সর্বজাতিকে সর্বনাশা মহামারণের যজ্ঞে যোগ দিতেই হলো। মহাভারতের সেই মহাযুদ্ধের পর তবু তো শান্তি ও স্বর্গারোহণ পর্ব এসেছিল, এই যুদ্ধে আর তা হবার নয়। বিশ্বব্যাপী সংঘর্ষ মহাপ্রলয় আসচে, এখন কোথায় শান্তি কোথায় স্বর্গ? তাঁর শঙ্খ রইলো পড়ে।"[১৯]

বিশ্বযুদ্ধের ছায়া, আশঙ্কা এভাবেই 'বলাকা'-র এই পর্বের কবিতার 'ভিতর ও বাহিরে' সমাচ্ছন্ন হয়ে আছে।

ছয়

'মত্ত সাগর দিল পাড়ি গহন রাত্রিকালে' 'বলাকা'র ৫ সংখ্যক 'পাড়ি' কবিতাটি ৫ ভাদ্র ১৩২১, কলকাতায় লেখা। এতদিন ছিল বিশ্বব্যাপী একটা প্রলয়কাণ্ডের আশঙ্কা, পৃথিবীময়

একটা ভাঙাচোরার আয়োজন — এবার তার সত্যিকারের খবর এসে পৌঁছেছে। সমস্ত ইউরোপ জুড়ে শুরু হয়েছে হিংসার উৎসব, ক্ষমতা আর শক্তির আস্ফালন। "য়ুরোপে তখন যুদ্ধ চলছে— এই চিন্তাটা মনের মধ্যে সুপ্ত চৈতন্যলোকে কাজ করছিল।"[২০] বিশ্বব্যাপী এই যুদ্ধকে ঘিরে 'পাড়ি' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি প্রশ্ন তুলেছেন। যুদ্ধের প্রমত্ত সাগর পেরিয়ে গহন রাত্রিকালে নৌকার পাল তুলে দিয়ে মাঝি ('নিত্যকালের কর্ণধার') আসছেন। এমন দুর্দিনে কেন আসছেন? কোন্ বড়ো সম্মান নিয়ে এবং কার জন্য তিনি আসছেন? কোন ঘাটে পৌঁছবেন তিনি?[২১] যিনি নিত্যকালের কর্ণধার বা মাঝি তিনিই তো 'ইতিহাস বিধাতা' — সমস্ত যুদ্ধ-ঝঞ্ঝা-মৃত্যু-হিংসার অমারাত্রি পেরিয়ে প্রেমের শান্তি আর সৌন্দর্যের বরমাল্য (এ সবই তাঁর ঐশ্বর্য, তাঁর সম্পদ) নিয়ে তিনি আসছেন অখ্যাতনামা সেই তপস্বী / তপস্বিনীকে পরিয়ে দেবেন বলে— 'মনুষ্যত্বের চরম লাঞ্ছনার দিনে পৃথিবীতে যাঁরা মঙ্গলের আদর্শ প্রচার করেছেন। অপরিচিত সেই তপস্বী / তপস্বিনী বিশ্বব্যাপী অসহায় মানুষের, দুধের শিশুর মৃত্যুমিছিলের পাশে এসে যাঁরা মানবতার কথা দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন। এণ্ডরুজের বক্তব্য এখানে প্রাসঙ্গিক :

> "পরপর কয়েকটি মাস কবির মানসিক উত্তেজনা ক্রমশ বেড়েই চলে, অবশেষে অতি ধীরে ধীরে সেই যন্ত্রণার হাত থেকে তিনি রেহাই পেলেন।
>
> য়ুরোপে মহাযুদ্ধের আগে আরম্ভের ভাগে এই বেদনা তাঁর পক্ষে দুঃসহ হয়ে উঠেছিল। তার একটি কারণ, যুদ্ধহেতু পৃথিবীর বিপর্যয়, অন্য কারণ বেলজিয়ামের প্রতি তাঁর আন্তরিক সমবেদনা। এই সময়ে একই সঙ্গে বাংলা এবং ইংরেজিতে তাঁর তিনটি কবিতা লিখিত ও প্রকাশিত হয়। সেইগুলি পড়ে আমরা বুঝতে পারি সেই সময়ে তাঁর মধ্যে কী দুঃসহ অন্তর্দ্বন্দ্ব চলেছিল। এর প্রথম কবিতাটির নাম 'The Boatman : পাড়ি' ('মত্ত সাগর দিল পাড়ি গহন রাত্রিকালে ঐ যে আমার নেয়ে')। এটি লেখার সময় তিনি আমাকে বলেছিলেন, সেই নির্জন প্রাঙ্গণে যে মেয়েটি ধুলায় বসে অপেক্ষা করছে সেটি বেলজিয়ামের প্রতীক।"[২২]

রুক্ষ অলক', 'সিক্তপলক আঁখি' গৌরবহীনা নারীকে 'বেলজিয়ামের প্রতীক' হিসেবে দেখলে অবশ্য 'পাড়ি' কবিতার বিকল্প একটি পাঠ তখন আমাদের সামনে ধরা পড়ে। সমকালীন রবীন্দ্রমানসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শ্রীমতী সেমূর[২৩]-কে লেখা একটি চিঠির উদ্ধৃতি দিয়ে 'রবিজীবনী'কার প্রশান্তকুমার পাল লিখেছেন :

> "যুদ্ধ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সমকালীন দৃষ্টিভঙ্গি আমরা প্রতিফলিত হতে দেখেছি 'মা মা হিংসীঃ' ও 'পাপের মার্জনা' উপাসনায়, 'পাড়ি' কবিতায় ও 'বাধা দিলে বাধবে লড়াই' গানে। কিন্তু সবচেয়ে তীব্র ভাষারূপ পেয়েছে 9 sep [বুধ ২৩ ভাদ্র] শ্রীমতী সেমূরকে লেখা একটি পত্রে : In Europe the War-fiend is abroad. The chained barbarism in the heart of the Western Civilisation. Fed in secret with the life-blood of alien races, has snapped its chain at last, springing at the throat of its own master.

Greed of Empire, worship of froce, cruel exsploitation of the helpless have had the sanction of science in the West, but the time is ripr when God Shall assert his own and man shall learn once again that his best instincts are based on Eternal truth and not upon and doctrine of science. [২৪]

১২ পৌষ ১৩২১, শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'বলাকা'র ১১ সংখ্যক 'বিচার' ('হে মোর সুন্দর') কবিতাটি। এটি আসলে খ্রিস্ট জন্মদিনের ভাষণটির কাব্যরূপ। কবিতাটি 'Judgement' নামে অনুবাদ করে এণ্ডরুজকে উপহার দিয়েছিলেন। 'কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথের রুদ্র ভাবনার ভিন্ন এক পরিসর উঠে এসেছে। 'হে মোর সুন্দর' কেবল নয়, 'বলাকা'র কবিতায় রবীন্দ্রনাথের রুদ্র ভাবনা নিয়ে স্বতন্ত্র আলোচনা জরুরি। পৃথিবী যখন অমঙ্গলের ভারে, পাপের উন্মত্ততায় ভরে ওঠে, শিবই তখন রুদ্র মূর্তিতে দেখা দেন। রুদ্রের দণ্ড— বিধাতার বিধান তখন নেমে আসে। রুদ্ররূপ প্রকাশের আগে, রুদ্রের দণ্ড নেমে আসার আগে— সাম্রাজ্যলোভী যুদ্ধোন্মত্ত রাষ্ট্রের হয়ে বিশ্ববিধাতা সেই 'সুন্দর', সেই রুদ্রের কাছে কবি ক্ষমা প্রার্থনা করেন :

"তোমারে কাঁদিয়া তবে কহি বারংবার
এদের মার্জনা করো হে রুদ্র আমার!
চেয়ে দেখি মার্জনা যে নামে এসে
প্রচণ্ড ঝঞ্ঝার বেশে
সেই ঝড়ে
ধুলায় তাহারা পড়ে;
চুরির প্রকাণ্ড বোঝা খণ্ড খণ্ড হয়ে
সে বাতাসে কোথা যায় বয়ে।
হে রুদ্র আমার,
মার্জনা তোমার
গর্জমান বজ্রাগ্নি শিখায়
সূর্যাস্তের প্রলয় লিখায়,
রক্তের বর্ষণে
অকস্মাৎ সংঘাতের ঘর্ষণে ঘর্ষণে।"[২৫]

ক্রুশবিদ্ধ হবার আগে যেমন করে পৃথিবীর সমস্ত পাপকে যীশু ধারণ করেছিলেন এবং সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে অনুরোধ করেছিলেন সব পাপীদের পাপকে মার্জনা করে দেবার জন্য — মানবতার পূজারী রবীন্দ্রনাথও সেভাবে প্রার্থনা জানিয়েছেন রুদ্রের কাছে।

'দূর হতে কী শুনিস মৃত্যুর গর্জন, ওরে দীন' 'বলাকা'র ৩৭ সংখ্যক এই কবিতাটি ২৩ কার্তিক ১৩২২, কলকাতায় লেখা। 'ঝড়ের খেয়া' নামে কবিতাটি 'প্রবাসী'তে পৌষ

১৩২২ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ নিয়ে লেখা রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে আলোচিত ও উল্লেখযোগ্য কবিতা 'ঝড়ের খেয়া'। কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ বেশ কয়েকবার পরিমার্জন ও সংযোজন করেছিলেন। মূল পাণ্ডুলিপির সঙ্গে সেই পাঠান্তরকে পাশাপাশি রেখে অসাধারণ এক পাঠ আমাদেরকে দিয়েছেন বিশিষ্ট রবীন্দ্র-বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য, 'ঝড়ের খেয়া'র আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন : "প্রত্যক্ষীভূত বিশ্বজীবনের প্রেক্ষাপটে রচিত এই কবিতাটি 'বিশ্বকবি'র সার্থকতম সৃষ্টি। ... ... ঝড়ের খেয়ায় বিঘোষিত হয়েছে বিশ্বমানবের মৃত্যুঞ্জয় যাত্রার বিজয়বার্তা।"[২৬] বিশ্বযুদ্ধের আনুষ্ঠানিক ঘোষণার এক বছর তিন মাস ব্যবধানে কবিতাটি রচিত :

"দূর হতে কী শুনিস মৃত্যুর গর্জন, ওরে দীন
ওরে উদাসীন —
ওই ক্রোন্দনের কলরোল,
লক্ষ বক্ষ হতে মুক্ত রক্তের কল্লোল।"[২৭]

'মৃত্যুর গর্জন', 'ক্রোন্দনের কলরোল' ও 'রক্তের কল্লোল' সম্মিলিতভাবে কবিতাটির শুরুতেই বিশ্বযুদ্ধের মৃত্যু পরিকীর্ণ হন্তারক সময়কে আমাদের সামনে এনে দেয়। ওই মৃত্যুর মধ্য দিয়ে, কামানের গোলা আর হিংসার উৎসবের মধ্য দিয়ে 'মানব ইতিহাসের তরীকে' নতুন যুগের ভোরে উত্তীর্ণ হতে হবে। দূর থেকে কাণ্ডারীর ('মানব ইতিহাসের কর্ণধার') ডাক শোনা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ তাই লিখেছেন :

"বহ্নিবন্যাতরঙ্গের বেগ,
বিষশ্বাস ঝটিকার মেঘ,
ভূতল-গগন—
মূর্ছিত-বিহ্বল-করা মরণে মরণে আলিঙ্গন—
ওরই মাঝে পথ চিরে চিরে
নূতন সমুদ্রতীরে
তরী নিয়ে দিতে হবে পাড়ি
ডাকিছে কাণ্ডারী,
এসেছে আদেশ —
বন্দরের বন্ধনকাল এবারের মতো হল শেষ"[২৮]

যাঁরা অভিযাত্রী যুদ্ধের মৃত্যু-আকীর্ণ সময় থেকে তাঁরা পৃথিবীকে নিয়ে যাবে নবযুগের রক্তাভ অরুণোদয়ের দিকে— কবি শুনতে পাচ্ছেন সেই আলোর পথযাত্রীরা মরণের গান গাইতে গাইতে ঘোর অন্ধকারের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন নবজীবনের অভিসারে :

"অজানা সমুদ্রতীর, অজানা সে দেশ—
সেথা কার লাগি
উঠিয়াছে জাগি
ঝটিকার কণ্ঠে কণ্ঠে শূন্যে শূন্যে প্রচণ্ড আহ্বান

মরণের গান
উঠিয়াছে ধ্বনিয়া পথে নবজীবনের অভিসারে
ঘোর অন্ধকারে।"[২৯]

যুদ্ধের নিজস্ব নিয়মে মৃত্যুর মিছিল দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়েছে। অসহায় নারী-শিশুদের নির্বিচারে হত্যার সংখ্যাটাও আর থাকেনি গণনার সংখ্যাধীন! যুদ্ধ যত এগিয়েছে— পারস্পরিক দোষারোপের সিক্যুয়েল তত দীর্ঘতর হয়েছে। এই যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাম্রাজ্যবাদী, ধনলিপ্সু, অস্ত্র ও ক্ষমতার প্রদর্শনকারী কোনো রাষ্ট্রই যুদ্ধের নৈতিক দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারে না। আজ মূল অপরাধীই জিজ্ঞাসা করছে অপরাধী কে? নিহত ১ কোটি ৩০ লক্ষ মানুষের মৃত্যুর জন্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সমস্ত রাষ্ট্রই দোষী। 'এ আমার এ তোমার পাপ'। সেই পাপে পৃথিবী আজ পূর্ণ — রবীন্দ্রনাথ পুঞ্জীভূত পাপের সেই বিরাট স্বরূপকে প্রত্যক্ষ করলেও শেষ পর্যন্ত তাঁর আশাবাদ ব্যক্ত করে তিনি বলেন:

"রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন?
নিদারুণ দুঃখরাতে
মৃত্যুঘাতে
মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্ত্যসীমা
তখন দিবে না দেখা দেবতার অমর মহিমা?"[৩০]

এই জিজ্ঞাসার মধ্যেই আছে উত্তর, আছে 'নিঃসংশয় প্রতীতি'। কেননা তিনিই তো লিখেছেন— 'শান্তি সত্য, শিব সত্য, সত্য সেই চিরন্তন এক'। পাঠক বুঝতে পারেন কবিতার আপাত এই জিজ্ঞাসা-সংশয়ের মধ্যেই আছে আশাবাদের, বিশ্বাসের, কাব্যের চরমতম সত্যের অনিবার্য প্রকাশ।

'পুরাতন বৎসরের জীর্ণ ক্লান্ত রাত্রি'— 'বলাকা'র ৪৫ সংখ্যক এই শেষ কবিতাটি ৯ বৈশাখ ১৩২৩ কলকাতায় লেখা। 'নববর্ষের আশীর্বাদ' নামে 'সবুজ পত্রে' বৈশাখ ১৩২৩ সংখ্যায় কবিতাটি প্রকাশিত হয়।

"পুরাতন বৎসরের জীর্ণ ক্লান্ত রাত্রি
ওই কেটে গেল ওরে যাত্রী!
তোমার পথের 'পরে তপ্ত রৌদ্র এনেছে আহ্বান
রুদ্রের ভৈরব গান।"[৩১]

'পুরাতন বছরের জীর্ণ ক্লান্ত রাত্রি' পেরিয়ে — নতুন সময়ের, নবজীবনের তীরে উপনীত হতে চেয়েছেন 'বলাকা'র কবি। হিংসার উৎসব থেমে গিয়ে, সমস্ত প্রলয়চিহ্ন মুছে গিয়ে মৃত্যু-আকীর্ণ সময়টা এখন রুদ্রের ভৈরব গানে মুখর। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

> "বেদের গান শেষ হয় পুনরুক্তি দিয়ে। আমার এই কবিতায় যদি 'বলাকা'র সব কথার আবার পুনরুক্তি হয়ে থাকে তবে ভালই হয়েছে। এই একটি কবিতার মধ্যে আমার সব কথার সারটুকু দিয়ে আমি 'বলাকা'র পালা শেষ করে দিচ্চি।"[৩২]

'নববর্ষের আশীর্বাদ' কবিতাটির শেষ পংক্তিতে রবীন্দ্রনাথ লেখেন :

"নাই বুঝি, নাই চিনি, নাই তারে জানি,
ধরো তার পাণি—
ধ্বনিয়া উঠুক তব হৃৎকম্পনে তার দীপ্ত বাণী।
ওরে যাত্রী
কেটে গেছে, যাক কেটে পুরাতন রাত্রি।"[৩৩]

ঠিকই, একটা বর্ষ শেষ হয়ে আরেকটা নতুন বছর এসেছে। ১৩২২ সাল সময়ের নিজস্ব নিয়মে চলে গিয়ে, ক্যালেন্ডারের নিজস্ব নিয়মে ১৩২৩ বঙ্গাব্দ এসেছে। শান্তিনিকেতনে বর্ষশেষ ও নববর্ষের উৎসব পালন করে রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় এসেছেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন "পুরাতনকে বিদায় দিয়ে নতুনের জয়গান গাওয়াই আমার কাজ।"[৩৪] ঠিকই লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ কিন্তু বিশ্বযুদ্ধ তো শেষ হয়নি এখনও। বিশ্বব্যাপী মহাপ্রলয়ের পরে, সমস্ত অতীত রাত্রির অবসান শেষে— মৃত্যু-দুঃখ-বেদনার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ নবযুগের যে রক্তাভ অরুণোদয়ের কথা বলেছিলেন— 'বলাকা'র ২ সংখ্যক 'সর্বনেশে' কবিতার— সেই প্রভাত কোন 'নববর্ষের আশীর্বাদ' আমাদের সামনে এনে দিল?

৯ই বৈশাখ ১৩২৩, ইংরেজি ২২ এপ্রিল ১৯১৬, শনিবার, রবীন্দ্রনাথ সেদিন 'বলাকা'র শেষ কবিতা লিখছেন। আমেরিকা তখন সবেমাত্র মিত্রশক্তির সঙ্গে যুদ্ধে যোগ দিয়েছে— ১৯১৭ তে কবি নজরুল ইসলাম যোগ দেবেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সেনাবাহিনী ঊনপঞ্চাশ নম্বর বাঙালি পল্টনে। যুদ্ধবিরোধী তরুণ ইংরেজ কবি উইলফ্রেড আওয়েন আমাদের কবিরই ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি'র একটি কবিতা (মূল বাংলা— 'যাবার দিনে এই কথাটি / বলে যেন যাই— / যা দেখেছি যা পেয়েছি / তুলনা তার নাই।') বুকপকেটে নিয়ে তখনও দেশের হয়ে যুদ্ধ করে চলেছেন মধ্য ইউরোপের রণাঙ্গণে। মারা যাবেন তারও কয়েকদিন পরে। যুদ্ধ শেষ হবে ১১ই নভেম্বর ১৯১৮। এর সবকিছু ধরা পড়ল না 'বলাকা'র কবিতায়— যেন হঠাৎই শেষ হয়ে গেল 'বলাকা'। বিশ্বযুদ্ধের সাপেক্ষে দেখলে কাব্য 'বলাকা'কে তাই খণ্ডিত মনে হয়। কোনো একটি কাব্যকে বিশ্বযুদ্ধের অজস্র ঘটনা, আদি-অন্তের সবটা ধারণ করতেই হবে, এমন চুক্তি বা দায়বদ্ধতা নেই কোথাও। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বলেই পাঠক হিসেবে সেই ইচ্ছেটা দুর্মর হয়ে ওঠে। 'বলাকা'র শেষ কবিতায় রবীন্দ্রনাথ নিজেই সেই ইচ্ছেটাকে দু-হাতে চেপে গুড়িয়ে দেন।

তথ্যসূত্র ও টীকা

১. ৬৪ সংখ্যক কবিতা ('নৈবেদ্য') : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'রবীন্দ্র রচনাবলী', ২ খণ্ড পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৪১৯, পৃ. ৪২১
২. ৬৫ সংখ্যক কবিতা ('নৈবেদ্য') : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পূর্বোক্ত।

৩. 'ঐকতান' (১৪ সংখ্যক কবিতা, 'জন্মদিনে') : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'রবীন্দ্র রচনাবলী', ৫ম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৪১৯, পৃ. ২৯১
৪. 'গ্রন্থপরিচয়' ('বলাকা') : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, নতুন সংস্করণ আশ্বিন ১৩৯৫, কলকাতা, পৃ. ১১৬
৫. 'মা মা হিংসীঃ' : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, ষোড়শ খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ২২ শ্রাবণ, ১৩৫০, কলকাতা, পৃ. ৪৯০
৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯২
৭. 'গীতবিতান' : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, নূতন সং পৌষ ১৩৮০ পৃ. ১১২। এটি 'গীতালি'র ৩ সংংখ্যক কবিতা
৮. 'পাড়ি' ('বলাকা') : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, নূতন সং- আশ্বিন১৩৯৫, পৃ. ১৭।
৯. 'পাপের মার্জনা' ('শান্তিনিকেতন'): রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী ষোড়শ খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ২২ শ্রাবণ ১৩৫০, পৃ. ৪৯৪।
১০. রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য প্রবেশক : প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, দ্বিতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, শ্রাবণ ১৪০৬, পৃ. ৪৫৫
১১. 'গ্রন্থপরিচয়' ('বলাকা') : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পুর্বোক্ত, পৃ. ১১৫
১২. 'রবীন্দ্রনাথ এণ্ডরুজ পত্রাবলী': মলিনা রায় (অনুবাদক), বিশ্বভারতী ২৫ বৈশাক ১৩৭৪, কলকাতা। [মূলগ্রন্থ- 'Letters to A Friend' : C. F. Andrews (Ed), George Allen & Unwin Ltd. London, 1928] পৃ. ২
১৩. 'সর্বনেশে' ('বলাকা') : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নূতন সং - আশ্বিন ১৩৯৫, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা পৃ. ১০
১৪. 'আহ্বান' ('বলাকা') : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পুর্বোক্ত, পৃ.১২
১৫. 'গ্রন্থপরিচয়' ('বলাকা') : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পুর্বোক্ত, পৃ.১১৭
১৬. 'শঙ্খ' ('বলাকা') : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পুর্বোক্ত, পৃ.১৪
১৭. 'গ্রন্থপরিচয়' ('বলাকা') : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পুর্বোক্ত, পৃ.১১৮
১৮. 'শঙ্খ' ('বলাকা') : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পুর্বোক্ত, পৃ.১৬
১৯. 'গ্রন্থ ভূমিকা' ('বলাকা' কাব্য পরিক্রমা) : ক্ষিতিমোহন সেন, এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ কলকাতা, পঞ্চম সং, পৃ. ৫৯
২০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৩
২১. 'গ্রন্থপরিচয়' ('বলাকা') : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কবিতার ব্যাখ্যা ও আলোচনা প্রসঙ্গে কবি নিজেই সেখানে এই ধরনের অনেকগুলো প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। নূতন সং - আশ্বিন ১৩৯৫ পৃ. ১২১
২২. 'রবীন্দ্রনাথ - এন্ডরুজ পত্রাবলী' : (অনুবাদ) মলিনা রায়, বিশ্বভারতী, ২৫ বৈশাখ ১৩৭৪, কলকাতা, পৃ. ১১
২৩. আমেরিকার আর্বানা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ আর্থার সেমূর স্ত্রী ছিলেন শ্রীমতী সেমূর। অধ্যাপক দম্পতি দুজনেই রবীন্দ্রনাথের বিশেষ গুণগ্রাহী।
২৪. 'রবিজীবনী' : প্রশান্তকুমার পাল, সপ্তম খণ্ড, আনন্দ সং - ১৪০৪, পৃ. ৩২

২৫. 'বিচার' ('বলাকা') : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪-৪৫
২৬. 'রবীন্দ্র কবিতা শতক' : জগদীশ ভট্টাচার্য, প্রথম খণ্ড, কবি ও কবিতা, অক্টোবর ১৯৭৪
২৭. 'ঝড়ের খেয়া' ('বলাকা') :রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পুর্বোক্ত, পৃ.৮৮
২৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৮
২৯. পূর্বোক্ত, পৃ ৯০
৩০. পূর্বোক্ত, পৃ ৯৩
৩১. 'নববর্ষের আশীর্বাদ' ('বলাকা') : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পুর্বোক্ত, পৃ.১১০
৩২. 'বলাকা' কাব্য পরিক্রমা' : ক্ষিতিমোহন সেন, এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ পঞ্চম সংস্করণ, কলকাতা, পৃ. ২১৬
৩৩. 'নববর্ষের আশীর্বাদ' ('বলাকা') : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পূর্বোক্ত, পৃ.১১১
৩৪. 'বলাকা কাব্য পরিক্রমা' : ক্ষিতিমোহন সেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৬

গ্রন্থঋণ :

তথ্যসূত্রে উল্লিখিত বই ছাড়াও সাহায্য নেওয়া হয়েছে—

১. 'পৃথিবীব্যাপী মহাসমর' : (অনুবাদ) রায় সাহেব শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ (মূলগ্রন্থ : 'The World at War' : J. Nelson Freser) অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, বোম্বাই এর মাদ্রাজ, ১৯১৯
২. The Origins of the World War : Sidney B. Fay, Vol. 1&11, New York, 1928
৩. 'Relocating the Origins of the First World War (1914)' : Kaushik Chakravorty, Readers Service, Kolkata, 2008
৪. 'প্রথম বিশ্বযুদ্ধ : শতবর্ষে ফিরে দেখা' — দেবব্রত ঘোষ ও সনৎকুমার নস্কর (সম্পাদিত), দীপ প্রকাশন, কলকাতা, ২০১৫

কৃতজ্ঞতা : জয়দীপ ঘোষ, সুমিতকুমার বড়ুয়া, আইভি আদক